OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 59
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 53 – 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

স্মৃতি ও সত্তার সংরাগে মঙ্গলকাব্য : ‘রূপসী বাংলা’-র কবিতায় লোকজ পুরাণের নবভাষ্য

চঞ্চল ভট্টাচার্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID: chanbhattaclass1998@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Ruposhi Bangla, Mongolkabya, Gangur, Kalidaha, Chand Sadagar, Behula, Mukundaram, Lahana, Prokriti, Mrityu, Puran.

Abstract
Jibanananda Das's posthumously published masterpiece, 'Ruposhi Bangla' (1957), is not merely a collection of nature poems but a profound fusion of Bengal's landscape and its thousand-year-old folklore. In this work, the poet utilizes the myths of medieval Mangal kavya to rediscover the roots and identity of the Bengali people. Through characters like Chand Sadagar and Behula, he portrays Bengal's eternal beauty and resilience, transforming ancient legends into living symbols of the land's spirit. Amidst the harshness of modern urbanization, Das seeks refuge in the magical world of Mukundaram and Bijay Gupta, crafting an immortal image of Bengal. For him, death is not a terror but a natural cycle—a quiet desire to merge with the scent of the 'Gangur' river and the familiar fields of home. By weaving together history, memory, and nature, 'Ruposhi Bangla' stands as an imperishable testament to the deep-seated emotions and cultural heritage of Bengal.

Discussion

জীবনানন্দ দাশ নামটি শুনলেই আমাদের মনে আসে ‘রূপসী বাংলার কবি’, ‘প্রকৃতি প্রেমের কবি’, ‘অতীতচারী কবি’, ‘নির্জনতম কবি’, ‘নির্জনতার কবি’। উল্লেখিত প্রত্যেকটি উপাধিই যে যথার্থ, তা এই প্রবন্ধ পাঠ করলেই বোঝা যাবে। আমাদের আলোচ্য ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় বঙ্গদেশের অসাধারণ বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির কথায় বার বার উঠে এসেছে। এই প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে কবি বার বার ফিরে গেছেন আমাদের পুরাণ, সাহিত্য, কাব্যে। কল্পনাকে সঙ্গী করে কবির মন বার বার ছুটে গেছে সুদূর অতীতে। জীবনানন্দ দাশ আসলে আমাদের অচেনা, অদেখা, রহস্যময় এক জগতের অধিবাসী ছিলেন। জীবনানন্দ সারাজীবন সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেছেন ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্যের বৃহত্তর পটে। তাই কবির মন কখনো ছুটে গেছে বেহুলা লখিন্দরের ভেলায়, কখনো বা গাঙুরের জলে, কখনো কালীদহে আবার কখনো তিনি ‘হাজার বছর ধরে পথ’ হেটে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আমাদের আলোচ্য

'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের যে কবিতা গুলিতে মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সেই সমস্ত কবিতাগুলির আলোচনা করে দেখার চেষ্টা করব, কীভাবে কবিতায় মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে!

'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে মোট ৬২টি কবিতা স্থান পেয়েছে। রূপসী বাংলা বাঙালির হৃদয়ের অত্যন্ত প্রিয় কাব্যগ্রন্থ, যার প্রতি ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত ও গভীর। ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকেই এটি বিপুল সাড়া জাগায় এবং ক্রমাগত তার জনপ্রিয়তা অটুট থাকে। গ্রন্থটির কবিতাগুলো মূলত সনেটধর্মী হলেও কঠোর গঠনশৈলী পাঠককে বাধা দেয় না; বরং সহজ, নির্মল অনুভূতির মাধ্যমে সরাসরি হৃদয় স্পর্শ করে। এখানে বাংলার প্রকৃতি, ইতিহাস, স্মৃতি ও আবেগ এক কোমল মাধুর্যে মিলিত হয়েছে, যা পাঠককে প্রশান্ত ও পবিত্র অনুভবে ভরিয়ে তোলে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, কবি জীবদ্দশায় এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেননি, যদিও তা বহু আগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ভূমেন্দ্র গুহর উদ্যোগে পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয় এবং প্রকাশের পথ সুগম হয়। কবি নিজেই একসময় এই কবিতাগুলোকে 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা' নামে গ্রন্থিত করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু পরে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। প্রকাশক পরে এর নাম পরিবর্তন করে 'রূপসী বাংলা' রাখেন, যা বইটির ভাব ও সৌন্দর্যকে অধিক সার্থকভাবে প্রকাশ করে।

ঐতিহাসিকভাবে অস্থির সময়— দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রেক্ষাপটে— এই কবিতাগুলোর প্রকাশ নিয়ে কবির দ্বিধা অস্বাভাবিক নয়। তবুও পরবর্তী সনয়ে এই কাব্যগ্রন্থ বাঙালির চেতনায় এক অমর স্থান অধিকার করে। এর কিছু কবিতা জাতীয় অনুভূতির প্রতীক হয়ে ওঠে, বিশেষত সংকটকালে মানুষকে সাহস ও আশার বাণী দেয়। ফলে বলা যায়, রূপসী বাংলা কেবল একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, বরং বাঙালির আত্মা ও অনুভূতির এক চিরন্তন প্রকাশ। এই কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর স্বচ্ছ ও নিরাভরণ আবেগ, যেখানে কোনো কৃত্রিমতা বা অহংকার নেই। বাংলার মাটি, নদী, মানুষ ও পুরাণ— সবমিলিয়ে এখানে এক চিরন্তন আত্মপরিচয়ের রূপ ফুটে ওঠে। বেহুলা-লখিন্দরের উপাখ্যানের মতো প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমে বাঙালির জীবনসংগ্রাম ও আবেগকে গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থে প্রতিটি কবিতার প্রথম পঙক্তি দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। আমরাও এই প্রবন্ধে আলোচ্য কবিতা গুলির নাম কবিতার প্রথম পঙক্তি অনুযায়ীই উল্লেকব করবো। প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন, -

> "বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কালপর্বে বিশেষ করে বিশ শতবের দ্বিতীয় পর্বে মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন কাহিনি বিচিত্র পথে পুনর্নির্মিত হয়েছে। আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক কালের সুবিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্য মঙ্গলকাব্যসমূহকে পুরাণ ও ঐতিহ্যের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছে।"[১]

আমরা মূলত দেখার চেষ্টা করবো, বাংলা মঙ্গলকাব্যের কোন বিশেষ আখ্যানগুলি কীভাবে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন এবং এগুলি ব্যবহারে কবির কোন দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে! 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' শীর্ষক কবিতায় কবি যখন চাঁদ সদাগর ও বেহুলার প্রসঙ্গ আনেন, তখন বোঝা যায় তিনি শুধু প্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছেন না, বরং বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য ও অনুভূতিকে একসূত্রে গেঁথে তুলছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের এই চরিত্রগুলো মধ্যযুগের হলেও আজও বাঙালির কল্পনা ও অনুভবে জীবন্ত। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার পথে বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য যেমন তাকে স্পর্শ করেছিল, তেমনি বর্তমান সময়েও সেই সৌন্দর্য অটুট রয়েছে— এই কথাই কবি ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন। বেহুলার প্রসঙ্গ তুলে কবি আরও গভীর এক অনুভূতির দিক নির্দেশ করেন। স্বামীর প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা এবং তার সংগ্রামের কাহিনি বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে এক অনন্য রূপ ধারণ করেছে। কবি বেহুলাকে শুধু পৌরাণিক চরিত্র হিসেবে দেখেননি, বরং তাকে বাঙালি নারীর প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তার ভেলায় ভেসে চলার পথে নদী, ধানের ক্ষেত, গাছপালার বর্ণনার মধ্য দিয়ে বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তার অন্তরের বেদনার কথাও প্রকাশ পেয়েছে।

"মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজলবট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিলো বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে-
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়-”[২]

তবে এই বেদনার মাঝেও প্রকৃতির স্নেহময় রূপ বেহুলার মনে নতুন শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। শ্যামা পাখির কোমল গানের উল্লেখের মাধ্যমে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাংলার প্রকৃতি দুঃখের মাঝেও মানুষকে সান্ত্বনা দেয় এবং বাঁচার প্রেরণা জাগায়। এই সজীবতা ও সৌন্দর্যই বেহুলাকে তার লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়সংকল্প করে তোলে। শেষ পর্যন্ত বেহুলার ইন্দ্রের সভায় নৃত্যের ঘটনাও এই অদম্য মানসিক শক্তিরই প্রকাশ। তার এই সংগ্রাম শুধু ব্যক্তিগত ভালোবাসার নয়, বরং বাঙালি জীবনের গভীর আবেগ ও দৃঢ়তার প্রতীক। কবি ‘ছিন্ন খঞ্জনা’র উপমার মাধ্যমে তার একাকীত্ব ও কষ্টকে প্রকাশ করেছেন, যা বাংলার সতী নারীর হৃদয়ের বেদনারই প্রতিফলন। তৎকালীন সময়ের নারীর অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে ছিন্ন খঞ্জনার মতো ইন্দ্রের সভায় বেহুলার নাচার প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে, এছাড়াও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্ধকারময় দিককেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলা বাহুল্য।

“...একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদ-নদী-ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।”[৩]

প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য ‘প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর’ গ্রন্থে ‘হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে নাকি’ শীর্ষক কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তাই এই প্রবন্ধে এই কবিতাটির আলোচনা না করে, অন্য কবিতাগুলির আলোচনা করা হল।

‘রূপসী বাংলা’ কাব্যের ‘যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে’ শীর্ষক কবিতায় কবি তাঁর অনিবার্য মৃত্যুর কথা ভেবেছেন। কবি জানেন একদিন তাঁকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু সেই চিরবিদায়ের মুহূর্তে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ বা আক্ষেপ নেই। কারণ, তিনি তাঁর জীবন এমন এক বাংলায় কাটিয়েছেন যা রূপ, রস এবং ঐতিহ্যে ভরপুর। বেহুলা বা লহনার মতো পৌরাণিক চরিত্রের ছোঁয়ায় তিনি বাংলার সাধারণ নারীর মাঝে মহিমা খুঁজে পেয়েছেন।

“...বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো – মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালি নারীর কাছে...”[৪]

এই কবিতাগুলি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বাংলা তথা ভারতবর্ষের অবক্ষয়ের সময়, এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে কবি অতীতচারী হয়ে, বাংলার নদী, মাঠ, ভাটফুলের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে বাংলার পুরাণ, সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে একটু আনন্দ খুঁজে পেতে চেয়েছেন। তাই তিনি বার বার ফিরে যান বেহুলা, লহনার সময়ে, তিনি মনে করেন তারাও বাংলার এই মাটিতেই বিরাজমান হয়েছিলেন এবং এই পথে, এই সবুজ প্রকৃতির মাঝেই তারা জীবনের সুখ-দুঃখ সমস্ত ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি অতীতে ফিরে গিয়ে একটু শান্তি পেতে চান।

‘ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে’ শীর্ষক কবিতায় কবি শেষ দু’টি চরণের ‘মনসামঙ্গল’ (ভাসানের গান) ও ‘বৈষ্ণব পদাবলীর’ (মাথুর পর্যায়) উল্লেখ করেছেন।

“ভাসানের গান শুনে কত বার ঘর আর খড় গেল ভেসে
মাথুরের পালা বেঁধে কত বার ফাঁকা হ’ল খড় আর ঘর।”[৫]

‘ভাসানের গান’ মূলত মনসামঙ্গলের গান। দেবী মনসার সন্তুষ্টির জন্য শ্রাবণ মাসে এই গান গাওয়া হয়। বাংলায় যখন বর্ষাকাল আসে, যখন চারিদিকে অথৈ জল, ঠিক সেই সময়েই ‘ভাসান’ বা ‘বেহুলার লহনার’ কাহিনি গীত হয়। কবি এখানে এক চমৎকার সমান্তরাল চিত্র এঁকেছেন। একদিকে মানুষ ঘরে বসে ভক্তির সাথে ভাসানের গান শুনছে, অন্যদিকে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বর্ষার বন্যায় তাদের ঘরবাড়ি ও খড়ের ছাউনি ভেসে যাচ্ছে। এটি বাঙালির নিয়তি— একদিকে

শিল্পের রস আস্বাদন, অন্যদিকে প্রকৃতির রুদ্ররূপের সাথে লড়াই। আমাদের মনে হয়েছে বর্ষাকালে প্রকৃতির প্রচণ্ড দাপটে ঘরের খড়ের চাল ভেসে যাওয়া ছাড়াও বোধহয় অন্য কোনো ইঙ্গিতও কী দেয় না এই একটি চরণ। যে সময়ে এই কবিতা লিখিত হচ্ছে সে সময়টার কথা ভাবলেই বোঝা যায় সাধারণ মানুষের করুণ অবস্থার কথা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সামাজিক,অর্থনৈতিক অবক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরে মানুষ খেতে পাচ্ছেন না, বসবাসের জায়গা পর্যন্ত হারিয়েছেন। এই অবস্থা তো ভাসমান অবস্থাই। মানুষ তো এই অবস্থায় ভাসানের গানই শুনতে পাবেন, উত্থানের গান যে শুনবেন না তা বলাবাহুল্য। সামাজিক সংকটের কাল প্রভাবে যেন মানুষ ভেসে যাচ্ছেন, তলিয়ে যাচ্ছেন অতল গভীরে। আবার অন্য দিকে 'মাথুরের পালা'-ও তো বিচ্ছেদ বা শূণ্যতার কথাই বলে। মানুষ তার পরিবার পরিজনদের হারিয়ে ক্রমশ শূণ্য হয়ে যাচ্ছেন। যে খড়কুটোটাকে অর্থাৎ আত্মীয়কে আশ্রয় করে মানুষ চিরজীবন বেঁচে থাকতে চান, সেই মানুষকেই মানুষ হারিয়ে ফেলছিলেন। কখনো মড়ক, কখনো দুর্ভিক্ষ, আবার কখনো ঋতু পরিবর্তনের টানে মানুষের সাজানো সংসার (খড় আর ঘর) উজাড় হয়ে গেছে।

'তোমার বুকের থেকে একদিন চ'লে যাবে তোমার সন্তান' শীর্ষক কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কথা। 'কালিদহ' বা 'গাঙুড়' নদী ব্যবহারের মাধ্যমে কবি আমাদের প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যের যুগে নিয়ে যান। মধ্যযুগের সেই গ্রামীণ বাংলা, যেখানে মানুষের জীবন ছিল নদীর জোয়ার-ভাটা আর দেব-দেবীর আশীর্বাদ-অভিশাপের সাথে যুক্ত, জীবনানন্দ সেই 'হারানো সময়'কে আধুনিক কবিতার ফ্রেমে ধরেন। তিনি প্রমাণ করতে চান যে, আধুনিক যুগে দাঁড়িয়েও বাঙালির রক্তে সেই প্রাচীন রূপকথার স্পন্দন রয়েছে।

জীবনানন্দ দাসের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটি মৃত্যুচেতনা, প্রকৃতির নশ্বরতা এবং বাংলার মাটির প্রতি কবির আমৃত্যু মমত্ববোধের এক অনন্য দলিল। এই কবিতায় কবি মৃত্যুকে কোনো বিভীষিকা হিসেবে দেখেননি, বরং একে দেখেছেন প্রকৃতির এক স্বাভাবিক ও অনিবার্য চক্র হিসেবে।

> "কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
> কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ
> জানি নাকো; —তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,
> কৃষ্ণা যমুনার নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
> লেগে থাকে চোখে মুখে— রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
> জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।"[৬]

মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ঘটনা,, যাকে এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কবিও মৃত্যুকে স্বাভাবিক হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন বারবার। বাংলা দুর্ভিক্ষের, মন্বন্তর অথবা প্রবল ঝড়ের কথা বলতে গিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত সেই কালীদহের কথায় মনে পড়েছে। চাঁদ সদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর যে ঝড়ের কবলে পড়েছিল, সেরকম মৃত্যু কবি চাননি। তিনি শান্ত-স্বাভাবিক ভাবে এই বাংলার মাঠ-ঘাটের ভিতর মরণকে বরণ করার কথা বলেছেন। তিনি কৃষ্ণা বা যমুনা নদী নয়, বাংলার নদী গাঙ্গুরের ঢেউয়ের কথায় উল্লেখ করেছেন কবিতায়।

'এখানে আকাশ নীল' শীর্ষক কবিতায় জীবনানন্দ বাংলার চিরচেনা প্রকৃতিকে এক অপার্থিব ও শান্ত সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছে। কবি এখানে কেবল প্রকৃতির বর্ণনা দেননি, বরং প্রকৃতির সাথে বাংলার লোকগাথা ও ইতিহাসকে একসূত্রে গেঁথেছেন। বাংলার এই নীল আকাশে সজিনা ফুলের হিম শাদা রঙ আর রোদের চঞ্চল ঝিলিক মিলে এক মায়াবী ছবি তৈরি করেছে, যেখানে প্রকৃতি কোনো জড় বস্তু নয় বরং রোদ সেখানে চুলে আঙুল বুলানো এক জীবন্ত সত্তা। এই চিরচেনা বনপথ আর মেঠো ধুলোর পরতে পরতে মিশে আছে ধনপতি, বেহুলা ও লহনার মতো প্রাচীন লোকগাথার অমর সব চরিত্রদের পদচিহ্ন। এই কাব্যেও তিনি মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

> "ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ;
> মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধূল,"[৭]

জীবনানন্দ দাসের এই চরণে বাংলার প্রকৃতি কেবল ঘাস-লতা-পাতার সমাহার নয়, বরং এটি আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল। কবি এখানে বর্তমানের রূপালি রোদ আর ঘন সবুজ বনভূমির ওপর প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের ছায়া ফেলেছেন। ধনপতি, শ্রীমন্ত বা বেহুলার মতো পৌরাণিক চরিত্ররা যে মেঠো পথ দিয়ে হেঁটেছিলেন বা যে বনের ছায়ায় জিরিয়েছিলেন, আজ আমরাও সেই একই প্রকৃতির স্পর্শে বড় হচ্ছি। কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাংলার প্রকৃতি আসলে এক অবিনশ্বর সত্তা, যার ধূলিকণায় আজও আমাদের পূর্বপুরুষ আর কিংবদন্তি নায়কদের পদচিহ্ন মুছে যায়নি, বরং পরম মমতায় মিশে আছে। জীবনানন্দ দাসের এই কবিতায় প্রকৃতি, ইতিহাস, পুরাণ এবং কল্পনা একাকার হয়ে গেছে। কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাংলার এই নীল আকাশ, সাদা সজিনা ফুল আর ঘন বনরাজি কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়— এর প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে আমাদের লোকগাথার নায়ক-নায়িকাদের স্মৃতি। এটি একটি ‘নস্টালজিক’ ভ্রমণ যেখানে বর্তমানের রোদ আর প্রাচীন বাংলার মিথ মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

কবিতার দ্বিতীয় পঙক্তিতে কবি বাংলার প্রকৃতির এক অমোঘ এবং আদিম রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন একটি বিশেষ অনুষঙ্গের মাধ্যমে— তা হল কোকিলের ডাক।

“কবেকার কোকিলের, জান কি তা? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতেছিলেন ব’সে দু’-পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়— থেমে থেমে যায়; —
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধান ক্ষেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।”[৮]

জীবনানন্দ দাশ এই পঙ্ক্তিগুলোতে বাংলার প্রকৃতিকে এক চিরন্তন ও ঐতিহাসিক সত্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি কোকিলের ডাককে কেবল একটি পাখির ডাক হিসেবে দেখেননি, বরং একে যুক্ত করেছেন বাংলার মধ্যযুগীয় কাব্য ও লোকগাঁথার সাথে। কবি কল্পনা করেছেন, যখন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য লিখছিলেন, তখন দুপুরের নিঝুম প্রকৃতিতে কোকিলের সেই মায়াবী ডাক তাঁর লেখনীকে বারবার থামিয়ে দিচ্ছিল— যেন প্রকৃতির সুর কবির সৃজনশীলতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আবার সেই একই সুর বেহুলার বিরহী যাত্রায় এক গভীর বিষাদ বয়ে আনে; মৃত স্বামীকে নিয়ে যখন বেহুলা গাঙুড়ের অন্ধকার জল ভেঙে ভেসে যাচ্ছিলেন, তখন ধানক্ষেত আর আমবনের আড়াল থেকে ভেসে আসা কোকিলের ডাক তাঁর চোখে অস্পষ্ট কুয়াশার মতো শোকাতুর হয়ে ধরা দিয়েছিল। মূলত, জীবনানন্দ বোঝাতে চেয়েছেন যে বাংলার এই প্রকৃতি আর তার রূপ-রস-শব্দ কোনো নির্দিষ্ট সময়ের নয়, বরং তা হাজার বছর ধরে বাঙালির ইতিহাস, কাব্য আর বিরহী হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে আছে।

‘শ্মশানের দেশে তুমি’ শীর্ষক কবিতাটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর জীবনানন্দ এই কবিতার মাধ্যমে বিশ্বকবির বিশালতা এবং বাংলার মাটির সাথে তাঁর নাড়ির টানকে এক অপূর্ব রূপকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ অর্জুনের মতো তেজস্বী হয়ে অজানার দেশে পাড়ি দিলেও তাঁর অন্তরে মিশে ছিল বাংলার আম-চাঁপা-কদমের ঘ্রাণ আর বল্লাল সেনের আমলের প্রাচীন ঐতিহ্য। শ্মশানসম বিষণ্ণ বাংলায় রবীন্দ্রনাথের বিদায়বেলায় জীবনানন্দের আকুল প্রার্থনা— বিশ্বপথিক এই মহান কবি যেন তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে বাংলার জীর্ণ মঠ, মরা গাঙ আর ধূলিময় প্রকৃতির বুকেই চিরস্থায়ী বাসা বাঁধেন। মূলত, বিশ্বজনীনতা আর বাংলার মাটির প্রতি নাড়ির টানের এক অপূর্ব মিলনই এই কবিতার মূল সুর।

জীবনানন্দ দাশের এই কবিতায় ‘কালীদহ’ ও ‘গাঙুড়’ ব্যবহারের মূল কারণ হলো রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন সত্তার পাশাপাশি তাঁর বাংলার আদি ও লোকজ শিকড়ের টান ফুটিয়ে তোলা।

"সাত সমুদ্রের জলে, — ঘোড়া নিয়ে গেছ তুমি ধূম্র নারীদেশে
অর্জুনের মতো, আহা, — আরো দূর ম্লান নীল রূপের কুয়াশা
ফুঁড়েছ সুপর্ণ তুমি — দূর রং আরো দূর রেখা ভালোবেসে;
আমাদের কালীদহ—গাঙুড়—গাঙের চিল তবু ভালোবাসা
চায় যে তোমার কাছে — চায়, তুমি ঢেলে দাও নিজেরে নিঃশেষে
এই দহে—এই চূর্ণ মঠে মঠে—এই জীর্ণ বটে বাঁধ বাসা।"[৯]

মধ্যযুগীয় মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনীর সাথে এই নাম দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনানন্দ বোঝাতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ কেবল আধুনিক বিশ্বের বা সাত সমুদ্রের কবি নন; তিনি বাংলার হাজার বছরের পুরোনো লোকগাঁথা, ঐতিহ্য আর মাটির স্পন্দনের সাথেও সমানভাবে মিশে আছেন। অর্জুনের মতো বিশ্ববিজয়ী এই মহাপ্রাণ কবি যেন শেষ পর্যন্ত বাংলার এই অতি সাধারণ নদী আর জীর্ণ জনপদের বুকেই নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দেন— এই চিরন্তন আর্তিই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। সহজ কথায়, কালীদহ ও গাঙুড় এখানে বাংলার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যে মঙ্গলকাব্যের অনুষঙ্গগুলো কেবল নিছক অতীতে ফিরে যাওয়া নয়, বরং তা ছিল বাঙালির আত্মপরিচয় খোঁজার এক গভীর শৈল্পিক সংগ্রাম। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, আধুনিকতার রুক্ষতা আর যান্ত্রিক নগরায়ণের ভিড়ে আমরা আমাদের আসল শেকড়কে হারিয়ে ফেলছি। তাই তিনি বারবার ফিরে গিয়েছেন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কিংবা বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-এর সেই মায়াবী জগতে, যেখানে বাংলার মাটি আর মানুষের আদিম ঘ্রাণ লেগে আছে। তাঁর কাছে বেহুলা বা লহনার মতো চরিত্রগুলো কেবল প্রাচীন পুঁথির পাতা থেকে উঠে আসা কোনো কাল্পনিক নারী নয়; বরং তারা বাংলার শাশ্বত সহনশীলতা, অদম্য মমতা আর অজেয় প্রাণশক্তির জীবন্ত প্রতীক।

যে সময় চারপাশের চেনা জগৎটা যুদ্ধের অস্থিরতা আর দ্রুত পরিবর্তনে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, জীবনানন্দ তখন মঙ্গলকাব্যের সেই রূপকগুলোকে ব্যবহার করে এক মৃত্যুঞ্জয়ী বাংলার ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর কবিতায় মৃত্যু মানেই চূড়ান্ত বিদায় নয়, বরং তা হল প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধানসিঁড়ি নদীর তীরে বা হিজল-তালের ছায়ায় আবার ফিরে আসা— যা মূলত মঙ্গলকাব্যের সেই অলৌকিক অথচ মাটির কাছাকাছি থাকা জীবনদর্শনেরই এক আধুনিক রূপ। ইতিহাস, লোকগাঁথা আর প্রকৃতির এই অপূর্ব মেলবন্ধনে তিনি এমন এক 'রূপসী বাংলা' নির্মাণ করেছেন, যেখানে সময় স্থির হয়ে আছে এবং প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে বাঙালির হাজার বছরের সঞ্চিত আবেগ ও ঐতিহ্য।

Reference:

১. ভট্টাচার্য প্রভাতকুমার, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিমা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০১২, পৃ. ১৮২
২. দাশ জীবনানন্দ, রূপসী বাংলা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ১২
৩. ঐ, পৃ. ১২
৪. ঐ, পৃ. ১৯
৫. ঐ, পৃ. ২১
৬. ঐ, পৃ. ২৯
৭. ঐ, পৃ. ৩৯
৮. ঐ, পৃ. ৩৯
৯. ঐ, পৃ. ৪৩

Bibliography:

অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী প্রণীত কবি কঙ্কনচণ্ডী, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ, ১৯২১

অরবিন্দ পোদ্দার, মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৫৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১-২০০২

জীবনানন্দ দাশ, রূপসী বাংলা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৭

তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিমা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০১২